আস্ সফ্

৬১

নামকরণ

সূরার চতুর্থ আয়াতের يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا আয়াতাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যাতে 'সফ' শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে এর নাযিল হয়ার সময়-কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি সম্ভবত ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িককালে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ এর মধ্যে যেসব পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি ইংগিত রয়েছে। তা সেই সময়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো ঈমানের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা অবলম্বন এবং আল্লাহর পথে জীবন কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ করা। এতে দুর্বল ঈমানের মুসলমানদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। যারা ঈমানের মিথ্যা দাবী করে ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে আবার যারা ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিল তাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন আয়াতে শুধু প্রথম দু'টি শ্রেণীকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন আয়াতে শুধু মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন আয়াতে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের প্রতি লক্ষ করে কথা বলা হয়েছে। কোন্ স্থানে কাদের উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা বক্তব্যের ধরন থেকেই বুঝা যায়।

শুরুতেই সমস্ত ঈমানদারদের এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, যারা বলে এক কথা কিন্তু করে অন্য রকম কাজ, তারা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। আর যারা ন্যায়ের পথে লড়াই করার জন্য মজবুত প্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা অত্যন্ত প্রিয়।

৫ থেকে ৭ আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল জাতি মূসা (আ) এবং ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যে আচরণ করেছে তোমাদের রসূল এবং তোমাদের দীনের সাথে তোমাদের আচরণ সেই রকম হওয়া উচিত নয়। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর রসূল একথা জানা সত্ত্বেও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তারা তাঁকে কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়েছে এবং হযরত ঈসার (আ) কাছ থেকে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখতে পাওয়ার পরও তাঁকে অস্বীকার করা থেকে বিরত হয়নি। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, ঐ জাতির

লোকদের মেজাজের ধরন-প্রকৃতিই বাঁকা হয়ে গিয়েছে এবং হিদায়াত লাভের তাওফিক বা শুভবুদ্ধি থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এটা এমন কোন বাঞ্ছনীয় বা ঈর্ষণীয় অবস্থা নয় যে, অন্য কোন জাতি তা লাভের জন্য উদগ্রীব হবে।

এরপর ৮ ও ৯ আয়াতে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টান এবং তাদের সাথে ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকরা আল্লাহর এই নূরকে নিভিয়ে দেয়ার যতই চেষ্টা-সাধনা করুক না কেন তা পুরা শানশওকতের সাথে গোটা পৃথিবীতে অবশ্যই বিস্তার লাভ করবে। মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন আল্লাহর মহান রসূলের আনীত দীন বা জীবনব্যবস্থা অন্য সব জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্যই বিজয়ী হবে।

অতপর ১০ থেকে ১৩ পর্যন্ত আয়াতে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা লাভের পথ মাত্র একটি। তাহলো খাঁটি ও সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পর ঈমান আনো এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এর ফল হিসেবে আখেরাতে পাবে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি, গোনাহসমূহের মাগফিরাত এবং চিরদিনের জন্য জান্নাত। আর দুনিয়াতে পুরস্কার হিসেবে পাবে আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা এবং বিজয় ও সফলতা।

সূরার শেষে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর হাওয়ারী বা সাহায্যকারীরা আল্লাহর পথে যেভাবে সহযোগিতা করেছে তারাও যেন অনুরূপভাবে 'আনসারুল্লাহ' বা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায় যাতে ইতিপূর্বে ঈমান আনয়নকারীগণ যেভাবে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছিলেন তারাও কাফেরদের বিরুদ্ধে তেমনি সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতে পারে।

আয়াত ১৪ **সূরা আস্ সফ-মাদানী** রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ① يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ② كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ
تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ
صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ④

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর তাসবীহ করেছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।[১]

হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা করো না? আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন কথা বলো যা করো না।[২] *আল্লাহ সেই সব লোকদের ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেয়াল।*[৩]

১. এটা এই ভাষণের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাদীদের তাফসীর, টীকা ১ ও ২। এ ধরনের ভূমিকা দিয়ে বক্তব্য শুরু করার কারণ হলো, পরে যা বলা হবে তা শোনা বা পড়ার আগে মানুষ যাতে একথা ভালভাবে বুঝে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা অভাবহীন এবং অমুখাপেক্ষী। তাঁর প্রতি কারো ঈমান আনা, সাহায্য করা এবং ত্যাগ ও কুরবানী করার ওপর তাঁর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। তিনি এর অনেক উর্ধে। তিনি যখন ঈমান গ্রহণকারীদের ঈমানের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার শিক্ষা দেন এবং বলেন, সত্যকে উন্নতশির করার জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করো তখন এ সব তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই বলেন। তাঁর ইচ্ছা তাঁর নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যেই বাস্তব রূপ লাভ করে। কোন বান্দা তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নে সামান্যতম তৎপরতাও যদি না চালায় বরং গোটা পৃথিবী সে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকরও হয় তবুও তার নিজের শক্তি ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা তা বাস্তব রূপ লাভ করে।

২. একথাটির একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ আছে যা এর শব্দসমূহ থেকেই প্রতিভাত হচ্ছে। এ ছাড়া একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষও আছে যা পরবর্তী আয়াতের সাথে

এটিকে মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায়। প্রথম উদ্দেশ্য ও লক্ষ হলো, একজন খাঁটি মুসলমানের কথা ও কাজে মিল থাকা উচিত। সে যা বলবে তা করে দেখাবে। আর করার নিয়ত কিংবা সৎসাহস না থাকলে তা মুখেও আনবে না। এক রকম কথা বলা ও অন্য রকম কাজ করা মানুষের এমন একটি জঘন্য দোষ যা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করার দাবী করে তার পক্ষে এমন নৈতিক দোষ ও বদ স্বভাবে লিপ্ত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। নবী (সা) ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে এরূপ স্বভাব থাকা প্রমাণ করে যে, সে মু'মিন নয় বরং মুনাফিক। কারণ তার এই স্বভাব মুনাফিকির একটি আলামত। একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ (زَادَ الْمُسْلِمُ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ)
اِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُتْمِنَ خَانَ (بخارى ، مسلم)

"মুনাফিকের পরিচয় বা চিহ্ন তিনটি (যদিও সে নামায পড়ে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করে)। তাহলো, সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে কোন আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি অন্য একটি হাদীসে বলেছেন ঃ

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ
مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا؛ اِذَا اُتْمِنَ خَانَ ،
وَاِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (بخارى، مسلم)

"চারটি স্বভাব এমন যা কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান। স্বভাবগুলো হলো, তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করলে নৈতিকতা ও দীনদারীর সীমালংঘন করে।"
(বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে যদি কোন ওয়াদা করে (যেমন কোন জিনিসের মানত করল) কিংবা মানুষের সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় অথবা কারো সাথে কোন বিষয়ে ওয়াদা করে আর তা যদি গোনাহর কাজের কোন প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা না হয় তাহলে পালন করা অবশ্য কতর্ব্য। তবে যে কাজের প্রতিশ্রুতি দেয়া বা ওয়াদা করা হয়েছে তা গোনাহর কাজ হলে সে কাজ করবে না ঠিকই কিন্তু তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সূরা মায়েদার ৮৯ আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। (আহকামুল কুরআন—জাস্সাস ও ইবনে আরাবী)।

এটা হলো এ আয়াতগুলোর সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ। এরপর থাকে এর সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ, যে জন্য এ ক্ষেত্রে আয়াত কয়টি পেশ করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতটিকে

এর সাথে মিলিয়ে পড়লেই সেই বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ জানা যায়। যারা ইসলামের জন্য জীবনপাত করার লম্বা লম্বা ওয়াদা করতো কিন্তু চরম পরীক্ষার সময় আসলে জান নিয়ে পালাতো সেই সব বাক্যবাগিশদের তিরস্কার করাই এর উদ্দেশ্য। দুর্বল ঈমানের লোকদের এই দুর্বলতার জন্য কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন, সূরা নিসার ৭৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ তোমরা সেই সব লোকদের প্রতি কি লক্ষ করেছ যাদের বলা হয়েছিল, নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। এখন যেই তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে অমনি তাদের একটি দল মানুষকে এমন ভয় করতে আরম্ভ করেছে যা আল্লাহকে করা উচিত কিংবা তার চেয়েও অধিক। তারা বলে ঃ হে আল্লাহ, আমাদের জন্য লড়াইয়ের নির্দেশ কেন লিপিবদ্ধ করে দিলে? আমাদেরকে আরো কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিলে না কেন? সূরা মুহাম্মাদের ২০ আয়াতে বলেছেন ঃ যারা ঈমান এনেছে তারা বলছিল, এমন কোন সূরা কেন নাযিল করা হচ্ছে না (যার মধ্যে যুদ্ধের হুকুম থাকবে), কিন্তু যখন একটি সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরা নাযিল করা হলো যাতে যুদ্ধের উল্লেখ ছিল তখন তোমরা দেখলে যাদের মনে রোগ ছিল তারা তোমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কাউকে মৃত্যু আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধের সময় এসব দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। সূরা আলে ইমরানের ১৩ থেকে ১৭ রুকূ' পর্যন্ত একাধারে এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতগুলোতে যেসব দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে, আয়াতগুলোর শানে নুযূল বর্ণনা প্রসংগে মুফাস্সিরগণ তার বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যারা জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে বলত ঃ হায়! আল্লাহ তা'আলার কাছে যে কাজটি সবচেয়ে বেশী প্রিয় তা যদি আমরা জানতাম তাহলে তাই করতাম। কিন্তু যখন বলে দেয়া হলো যে, সেই কাজটি হলো জিহাদ, তখন নিজেদের কথা রক্ষা করা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে এসব লোক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হলে তারা নবীকে (সা) ফেলে রেখে জান নিয়ে পালিয়েছিল। ইবনে যায়েদ বলেন ঃ বহু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই মর্মে আশ্বাস দিত যে, আপনাকে যদি শত্রুর মুখোমুখি হতে হয় তাহলে আমরা আপনার সাথে থাকব। কিন্তু শত্রুর সাথে মুখোমুখি হওয়ার সময় আসলে তাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণিত হত। কাতাদা এবং দাহ্হাক বলেন ঃ কোন কোন লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত ঠিকই, কিন্তু তারা কোন কাজই করত না। কিন্তু যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বড় গলায় বলত ঃ আমি এভাবে লড়াই করেছি, আমি এভাবে হত্যা করেছি। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা এই প্রকৃতির লোকদেরকে তিরস্কার করেছেন।

৩. এর দ্বারা প্রথমত জানা গেল যে, কেবল সেই ঈমানদারই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হয় যারা তাঁর পথে মরণপণ করে কাজ করতে এবং বিপদ আপদ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত, জানা গেল যে, আল্লাহ যে সেনাদলকে পছন্দ করেন তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। এক, তারা বুঝে শুনে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পথে লড়াই করবে এবং এমন কোন পথে লড়াই করবে না যা 'ফী

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝٥

তোমরা মূসার সেই কথাটি স্মরণ করো যা তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন। "হে আমার কওমের লোক, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও? অথচ তোমরা ভাল করেই জানো যে, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসূল।[৪] এরপর যেই তারা বাঁকা পথ ধরলো অমনি আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ ফাসেকদের হিদায়াত দান করেন না।[৫]

সাবীলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পথের সংজ্ঞায় পড়ে না। দুই, তারা বিচ্ছিন্নতা ও শৃঙ্খলহীনতার শিকার হবে না, বরং মজবুত সংগঠন সুসংহত অবস্থায় কাতারবন্দী বা সুশৃঙ্খল হয়ে লড়াই করবে। তিন, শত্রুর বিরুদ্ধে তার অবস্থা হবে "সুদৃঢ় দেয়ালের" মত। এই শেষ গুণটি আবার অর্থের দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক। যুদ্ধের ময়দানে কোন সেনাবাহিনীই ততক্ষণ পর্যন্ত সুদৃঢ় দেয়ালের মত দুর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী সৃষ্টি না হবে ঃ

—আকীদা-বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য। এ গুণটিই কোন সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিক অফিসারকে পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ করে।

—পরস্পরের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ওপর আস্থা। প্রকৃতপক্ষে সবাই নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষে নিষ্ঠাবান এবং অসদুদ্দেশ্য থেকে মুক্ত না হলে এ গুণ সৃষ্টি হতে পারে না। আর এ গুণ যদি সৃষ্টি না হয় তাহলে যুদ্ধের মত কঠিন পরীক্ষা কারো কোন দোষ-ত্রুটি গোপন থাকতে দেয় না। আর আস্থা নষ্ট হয়ে গেলে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য পরস্পরের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করে।

—নৈতিক চরিত্রের একটি উন্নত মান থাকতে হবে। সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সাধারণ সৈনিক যদি সেই মানের নীচে চলে যায় তাহলে তাদের মনে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হতে পারে না। তারা পারস্পরিক কোন্দল ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ থেকেও রক্ষা পেতে পারে না।

—উদ্দেশ্য ও লক্ষের প্রতি এমন অনুরাগ ও ভালবাসা এবং তা অর্জনের জন্য এমন দৃঢ় সংকল্প থাকা চাই যা গোটা বাহিনীর মধ্যে জীবনপাত করার অদম্য আকাংখা সৃষ্টি করে দেবে আর যুদ্ধের ময়দানে তা প্রকৃতই মজবুত দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে যে শক্তিশালী সামরিক সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল, যার সাথে সংঘর্ষে বড় বড় শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং শতাব্দীর পর

শতাব্দী কোন শক্তি যার মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারেনি এ সব গুণ ও বৈশিষ্টই ছিল তার ভিত্তি।

৪. কুরআন মজীদের বেশ কয়েকটি স্থানে অতি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসাকে আল্লাহর নবী এবং তাদের পরম কল্যাণকামী হিসেবে জানার পরও বনী ইসরাঈল তাঁকে কতভাবে কষ্ট দিয়েছে এবং কিভাবে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সূরা বাকারাহ, আয়াত ৫১, ৫৫, ৬০, ৬৭ থেকে ৭১; আন নিসা, আয়াত ১৫৩; আল মায়েদা, আয়াত ২০ থেকে ২৬; আল আ'রাফ, আয়াত ১৩৮ থেকে ১৪১, ১৪৮ থেকে ১৫১; ত্বা হা, আয়াত ৮৬ থেকে ৯৮। বাইবেলে ইহুদীদের নিজেদের বর্ণিত ইতিহাসও এ ধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। শুধু নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার জন্য দেখুন, যাত্রা পুস্তক, ৫ ঃ ২০—২১, ১৪ ঃ ১১—১২; ১৬ ঃ ২—৩; ১৭ ঃ ৩—৪; গণনাপুস্তক, ১১ঃ ১১—১৫; ১৪ ঃ ১—১০; ১৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ; ২০ ঃ ১-৫; কুরআন মজীদের এ স্থানটিতে এসব ঘটনার প্রতি ইংগিত করে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল জাতি তাদের নবীর সাথে যে আচরণ করেছিল তারা যেন তাদের নিজেদের নবীর সাথে ঐরূপ আচরণ না করে। অন্যথায় বনী ইসরাঈল যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছিল তারাও সেই একই পরিণামের সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষা পাবে না।

৫. অর্থাৎ যেসব মানুষ ইচ্ছা করে বাঁকা পথে চলতে চায় অযথা তাদেরকে সোজা পথে চালান এবং যারা আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য বদ্ধপরিকর তাদেরকে জোর করে হিদায়াত দান করা আল্লাহর নিয়ম বা রীতি নয়। এর দ্বারা একথা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোন ব্যক্তি বা জাতির গোমরাহীর সূচনা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় না বরং স্বয়ং সেই ব্যক্তি বা জাতির পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নিয়ম বা বিধান হলো, যারা গোমরাহীকে গ্রহণ করে তিনি তাদের জন্য সঠিক পথে চলার উপায়-উপকরণ নয়, বরং গোমরাহীর উপায়-উপকরণই সরবরাহ করেন যাতে যেসব পথে তারা নিজেদেরকে নিয়ে যেতে চায় সেসব পথে যেন অবাধে যেতে পারে। আল্লাহ তো মানুষকে বাছাই করে নেয়ার স্বাধীনতা (Freedom of choice) দিয়েছেন। এরপর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিটি মানুষের বা মানুষের দল ও গোষ্ঠীর নিজের কাজ যে, তারা তাদের রবের আনুগত্য করবে কি করবে না এবং সঠিক পথ গ্রহণ করবে না বাঁকা পথের কোন একটিতে চলবে। এই বাছাই ও গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন জবরদস্তি নেই। কেউ যদি আনুগত্য ও হিদায়াতের পথ বেছে নেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জোর করে গোমরাহী এবং নাফরমানীর পথে ঠেলে দেন না। আর কেউ যদি নাফরমানী করা এবং সঠিক পথ অনুসরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তাহলে তাকে জোর করে আনুগত্য ও হিদায়াতের পথে নিয়ে আসাও আল্লাহর নিয়ম নয়। কিন্তু এটাও একটা বাস্তব ব্যাপার যে, কেউ নিজের জন্য যে পথই বেছে নিক না কেন সে পথে চলার জন্য উপায়-উপকরণ আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ সরবরাহ না করেন এবং অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ পথে কার্যত এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। এটাই হলো আল্লাহর দেয়া তাওফীক বা আনুকূল্য যার ওপর মানুষের প্রতিটি চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ভাল কাজের তাওফীক আদৌ না চায়, বরং উল্টা মন্দ ও পাপ কাজের তাওফীক চায় তাহলে সে তাই